ঢাকা শহরের পরিবেশ

মোঃ মুহিবুর রহমান

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেন তিন বৎসর পূর্বে ঢাকায় এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি তার কোন বন্ধুকে ঢাকায় বাস করতে উপদেশ দেবেন না। তার বৎসর দুই আগে এক জার্মান মেডিকেল টিম ঢাকা থেকে দেশে ফিরে একটি জার্মান দৈনিকে ঢাকা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ঢাকা শহরকে একটি 'ডাস্টবিন' এর সাথে তুলনা করেছিলেন।

গত তিন বৎসরে ঢাকা শহরের পরিবেশের উন্নতি হয় নি। এই শহরের বাতাস দূষিত, পানি দূষিত এবং এই দূষণ দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের বাতাসের দূষণ মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা এর পরিমাপ না করেই বলা যায় যে দূষণ মাত্রা বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই দূষিত শহরের এই দুরাবস্থার জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই।

ঢাকা শহরের পরিবেশ বর্ণনা করতে গেলেই যে দৃশ্য মনের পর্দায় ভেসে উঠে তা হলো অসংখ্য মানুষ, রাস্তাঘাটে অসংখ্য যানবাহন যার প্রধান অংশ হলো রিকসা, যানবাহনের হর্ণের শব্দ, আর সর্বত্র ময়লা-আবর্জনার স্তুপ, প্রস্রাবের গন্ধ। ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় প্রতিদিন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে সামনে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে, পুরানো শহরের বেশীর ভাগ রাস্তাতেই ফুটপাথ নেই এবং সরু রাস্তার যানবাহনের ভিড়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, পথচারিদের হাঁটার কোন স্থান থাকে না। পাবলিক টয়লেট ঢাকায় অত্যন্ত দুর্লভ, সুতরাং পথচারীরা আর রিকশা চালকসহ দিনমজুররা রাস্তাকেই প্রকৃতির ডাকে উত্তর দেয়ার জন্য বেছে নিতে বাধ্য হন। অনেক স্থানে ফুটপাথ দিয়ে চলাফেরা করা সম্ভবই হয় না, নাকমুখ বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এগুতে হয় গন্তব্যস্থলের দিকে। গৃহস্থালীর বর্জ্য অপসারণের জন্য নগর কর্তৃপক্ষ যেসব ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করেছেন, তাদের অবস্থাও করুণ। ঝাড়ুদাররা ময়লা নিয়ে ডাস্টবিন পর্যন্ত যেতে পারেন না বা যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না, ডাস্টবিনের পাশেই ময়লা ফেলে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তারপর যারা ডাস্টবিন থেকে বিভিন্ন বস্তু উদ্ধার করে জীবিকা অর্জন করেন, তারা ডাস্টবিনের ময়লাটুকু চারদিকে ছড়িয়ে দেন। নগরীর বেশীর ভাগ ড্রেনই ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং এফ্লুয়েন্ট বয়ে যেতে পারে না, উপচে পড়ে, যার ফলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মোটর যানের হর্ণের শব্দ ঢাকাবাসীদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করে দেখা গিয়েছে ঢাকার ব্যস্ত এলাকায় নয়েজ লেভেল গ্রহণযোগ্য সীমার অনেক উপরে থাকে, বড় বড় বাস ট্রাক হাইড্রলিক হর্ণ বাজিয়ে নগরীর রাস্তায় চলে, যদিও এই ধরনের হর্ণ নিষিদ্ধ। বিভিন্ন মার্কেটে ইলেকট্রনিক গানবাজনার যন্ত্রপাতির দোকানে 'ফুল ভলিয়ুমে' হয়ত বা পাশের দোকানের সাথে প্রতিযোগিতা করে এত জোরে হিন্দি এবং পাশ্চাত্য মিউজিক বাজানো হয় যে সামনে দাঁড়ানো লোকটির সাথেও স্বাভাবিক কথোপকথন সম্ভব হয় না। এটাও ঢাকাবাসীদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, কেউ কখনো প্রতিবাদ করে না।

বিশ্বের বড় বড় নগরীর একটা প্রধান আকর্ষণ সাধারণতঃ পাশ দিয়ে বা মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদী। যা নগরীকে উন্মুক্ত স্থানই শুধু দেয় না, নগরবাসীদের বিনোদনেরও একটা সুযোগ তৈরী করে। ঢাকা শহরও এই রকম একটা নদীর তীরে অবস্থিত, এবং এককালে নাকি এই নদীর তীরের রাস্তা দিয়ে পায়চারী করা অত্যন্ত উপভোগ্য বিনোদন ছিল নগরবাসীদের জন্য। এখন আর কেউ এই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে বুড়িগঙ্গার তীরে যান না, যান নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে। সলিমুল-হ মেডিকেল কলেজের নদী তীরস্থ হোস্টেলের একজন ছাত্রীর মতে 'এটাতো নদী নয়, এটা একটা বড় ড্রেন'। ড্রেনই বটে! নগরীর ময়লা বর্জ্য – মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য থেকে শুরু করে কলকারখানার সব ধরনের বর্জ্যের জন্য বুড়িগঙ্গা নদী হলো ড্রেন। মাঝে মাঝে দেখা যায় মৃত পশুর দেহ ভেসে যাচ্ছে। পানির বর্ণ এমন যে পানি না বলাই ভালো। আর নদীর তীর দিয়ে এমন কোন রাস্তা নেই যেটা দিয়ে পায়চারীর হাঁটাচলা আনন্দদায়ক হতে পারে। ঢাকা শহরের মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলো ট্যানারী থেকে বর্জ্য, যার প্রধান ক্ষতিকর উপাদান হলো ক্রোমিয়াম, নির্দ্বিধায় বুড়িগঙ্গায় ঢালা হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনেকগুলো ঔষধ শিল্প গড়ে উঠেছে। এছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট অগণিত কারখানা রয়েছে, যেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সব কলকারখানার তরল বর্জ্য নির্দ্বিধায় অপরিশোধিত অবস্থায় নগরীর ড্রেনে ঢালা হচ্ছে, যা বিভিন্ন ভাবে ভূগর্ভে গিয়ে যেমন ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত করছে, আবার বুড়িগঙ্গার পানিও দূষিত করছে। ঢাকার অগণিত মোটর গাড়ির বর্জ্য মবিল যত্রতত্র নিক্ষেপ করা হচ্ছে, এ ব্যাপারেও কোন ধরনের আইন আছে কিনা সন্দেহ।

ঢাকা নগরীতে এখন গভীর নলকূপের সাহায্যে বেশীর ভাগ পানি সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক নগরবসী এখনও এই পানি সরবরাহ থেকে বঞ্চিত এবং তারা অগভীর নলকূপের পানির উপর নির্ভরশীল। এই পানি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া ওয়াসার (WASA) পানি মুলত বিশুদ্ধ হলেও গৃহস্থালীতে পৌছানো পর্যন্ত আর বিশুদ্ধ থাকে না। কারণ ভূগর্ভস্থ পানির লাইনগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই, যাদের সামর্থ্য আছে, তারা পানি ফুটিয়ে ব্যবহার করতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছে।

নগরীর বায়ু দূষণের প্রতিক্রিয়া একটু দেরীতে ধরা পড়ে। কারণ দূষক সমূহ অদৃশ্য, তাদের প্রভাব জনস্বাস্থ্যকে প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শুকনো মৌসুমে সর্দি-কাশি-ব্রংকাইটিস-এর প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। ডাক্তারের চেম্বারেও ভিড় বৃদ্ধি পায়। বর্ষা মৌসুমে এই প্রভাব কম – বায়ুমণ্ডল থেকে দূষক সমূহের অপসারণ বৃষ্টি দ্বারা ত্বরান্বিত হয়, তবে দিনের বিশেষ সময়ে নগরীর বিশেষ এলাকায় এই প্রভাব অনুভব করা যায়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। যখন রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হয়, এবং আপনি যদি রিকসা, বেবী টেক্সি বা সাধারণ যানবাহনের যাত্রী এমন কি পথচারী হন, বায়ু দূষণের প্রভাব অনুভব করতে পারবেন আপনার নিঃশ্বাসের মাধ্যমেই, ক্লান্তি বোধ করবেন। আর যদি এমন ঘটনা ঘটে যে আপনার পাশ দিয়ে একটি বড় ট্রাক বা বাস বা পাজেরো জীপ এক রাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেলো, তাহলে আপনি কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ রাখার চেষ্টা করতে বাধ্য হবেন। দুই-স্ট্রোকের অটোরিক্সার সংখ্যা এখন নগরীতে কমেছে। এই জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাতে হয়, তবে এখনও তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। আপনার যাত্রার পথে কিংবা সামনে এ ধরনের কয়েকটি অটোরিক্সা থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই

আপনি তাদের প্রভাব আপনার নিঃশ্বাসের মধ্যে টের পাবেন।

ঢাকা শহরে যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন-মনো-অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ হয়ত বিশ্বের অন্যান্য বড় বড় শহরের তুলনায় খুব বেশী নয়। তবে আমার ধারণা হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। এর মূলে রয়েছে যানবাহনের ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিন এবং শিল্প এলাকায় যত্রতত্র জৈব বর্জ্য নিক্ষেপ। ঢাকার বাতাসে অর্গানিক দূষকের অবস্থা আমার জানা মতে এখনও পরিমাপ করা হয় নাই। তবে ঢাকার বাতাস বিশ্বের অন্যান্য বড় বড় শহরের তুলনায় বেশী দূষিত, তার কারণ বাতাসের মধ্যে ধূলিকণার অত্যাধিক্য। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের কোন এক স্টাডিতে দেখানো হয়েছে যে এই ধূলিকণার বেশীর ভাগের মূলে রয়েছে নগর কর্তৃপক্ষের অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড। সমস্যাটি অধিকতর প্রকট এই জন্য হয় যে এই সব কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, শুকনো মৌসুমেই পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই সব ধূলিকণা নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুস পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে, যার ফলে এদের দ্বারা অধিশোষিত বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া এই সব ধূলিকণার উপরিতলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক দূষক যৌগ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকতর ক্ষতিকর দূষক যৌগ উৎপন্ন হতে পারে।

ঢাকা শহরের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ দৈনিক ১৫-১৬ ঘন্টা কর্মস্থলে থাকতে বাধ্য হন এবং তারা এই দীর্ঘ সময় দূষিত বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হন। গুলিস্থান এলাকায় ফুটপাথের বা ফুটপাথের পাশের দোকানের কর্মচারীর কথাই ধরা যাক। সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়। অনেককে রাস্তাতেই রাত্রি যাপন করতে হয়। এছাড়া অনেক নগরবাসী রয়েছেন, যারা কর্মস্থলে এমন বদ্ধ পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হন, যেখানে অক্সিজেন-এর পরিমাণ কমটা স্বাভাবিক। গাউসিয়া মার্কেটের কথাই ভাবুন, এখানে ভিতরের দোকনগুলোতে মুক্ত বাতাস প্রবেশের সম্ভাবনা নেই বললে চলে। অথচ এখানে কর্মচারীগণ প্রতিদিন ১২ ঘন্টারও বেশী কাজ করেন।

নগরীতে জনসংখ্যা ও ঘরবাড়ীর সংখ্যার তুলনায় রাস্তাঘাট যেমন অপ্রতুল, খোলা পার্ক বা বাগানও তেমন নেই এবং নগরীর বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন বা বিবর্তন লক্ষ্য করলে মনে হবে – এর প্রতি কারো গরজও তেমন নেই। তা না হলে কেন নিউ মার্কেটের ভিতরের খোলা স্থানে আবার দোতলা ভবন তৈরী করে দোকান তৈরী হবে, অপ্রশস্ত রাস্তার পাশে বহুতল দালান তৈরী হবে (নিউ এলিফেন্ট রোড) লেইক ভরাট করে আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবন তৈরী হবে (গুলশান লেইক)? অর্থনৈতিক চাপের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেয়া কি যায়? ঢাকা শহরের অপরিকল্পিত বৃদ্ধি কি পরিহারযোগ্য ছিল না? ঢাকা নগরীর এই দুরবস্থার মূলে রয়েছে আমাদের মানসিকতা। আমরা এখনও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শিখি নাই। এখনও আমাদের মধ্যে আইনানুগ নাগরিক হওয়ার প্রবণতা জাগে নাই। এখনও আমরা নিজেদের দেশকে সত্যিকারের অর্থে নিজের দেশ বলে ভাবতে পারি না। তা না হলে কেন এখনও অতি সম্প্রতি শত কোটি টাকা ব্যয়ে সাজিয়ে তোলা ধানমণ্ডি লেইক এর মধ্যে বিত্তবানদের বাসভবন থেকে বর্জ্য নিক্ষেপ করা হয়, যার ফলে দুই বৎসরের মধ্যে লেইকটির অবস্থা পূর্ববৎ হয়ে গেলো। ❑

লেখক পরিচিতি ঃ **ড. মোঃ মুহিবুর রহমান** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক।

বুড়িগঙ্গার সমস্যা, প্রভাব এবং আমাদের করনীয়

আবু নাসের খান

একথা এখন সর্বজনস্বীকৃত ঢাকা শহরের অস্তিত্ব বুড়িগঙ্গা নদীর অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঢাকা শহরের পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখা এবং যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবে বুড়িগঙ্গার অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাওয়ায় এবং পানির গুণগত মান ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাওয়ায় ঢাকার জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধনশীল পানির চাহিদা মিটানোর জন্য আমাদেরকে ঢাকার আশে পাশে বিদ্যমান বুড়িগঙ্গা সহ কয়েকটি নদীর উপর ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে।

ঢাকার জনজীবনের ওপর বুড়িগঙ্গার ব্যাপক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বুড়িগঙ্গার বর্তমান চিত্র যে কোন সচেতন নাগরিককে বিচলিত করবে। সচেতন সমাজ তাই বুড়িগঙ্গার অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে বুড়িগঙ্গা রক্ষার দাবী আজ গণদাবীতে পরিণত হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় যে, প্রায় ৫০০ বছর আগে বুড়িগঙ্গা নদীর উৎপত্তি। এর নামকরণ নিয়ে বলা হয় এ নদী গঙ্গার একটি পুরাতন শাখা। তাই এই নদীর নামকরণ করা হয়েছে বুড়িগঙ্গা।

বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা । এ নদী সাভারের দক্ষিণ হতে উৎপন্ন হয়ে বেতেরচর নামক স্থানে আবার ধলেশ্বরী নদীতে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে এই নদীর উৎপত্তিস্থল একেবারে শুকিয়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় এ নদীর দৈর্ঘ্য ছিল ২৭ কিলোমিটার কিন্তু বর্তমানে তা অনেকাংশে কমে এসেছে। ১৬১০ খ্রীষ্টব্দে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকাকে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত করেন এবং দিল-ীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে এর নাম হয় জাহাঙ্গীর নগর। তখন দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল জলপথ। তখন থেকেই বুড়িগঙ্গাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে। এই বুড়িগঙ্গার অনতিদূরে গড়ে ওঠে নানা ঐতিহাসিক নির্মাণকাজ – লালবাগের কেল-া, আহসান মঞ্জিল ইত্যাদি। বিনোদন ও নান্দনিকতার কেন্দ্রও ছিল বুড়িগঙ্গা। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও বিকেলে-সন্ধ্যায় ছুটে যাওয়া যেত সোয়ারিঘাটে নৌকা ভ্রমণে। বুড়িগঙ্গার সেই নির্মল বায়ু বাকল্যান্ড বাঁধের ধারে ভ্রমণ আজ যেন ঐতিহাসিক তথ্য।

আজ থেকে একশত পঁচিশ বছরেরও অধিক সময় আগে ১৮৭৪ সালে ঢাকা শহরবাসীর জন্য সরকারি উদ্যোগে পানি সরবরাহের নিমিত্তে পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয় ঢাকার চাঁদনিঘাট এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর কাছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বুড়িগঙ্গা একদিকে যেমন ছিল একটা নানন্দিক কেন্দ্র অন্যদিকে এটি ছিল যোগাযোগের মাধ্যম, মৎস্য ও পানি সরবরাহের উৎস এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার কেন্দ্রস্থল। প্রকৃতপক্ষে এই নদীকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠে ঢাকার সম্পূর্ণ ইকো-সিস্টেম।

বুড়িগঙ্গার প্রধান সমস্যাসমূহ

প্রকৃতপক্ষে বুড়িগঙ্গার পাড়ে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা এবং বুড়িগঙ্গার জমি দখলকে বুড়িগঙ্গার একমাত্র সমস্যা বলে চিহ্নিত করলেও আমরা বুড়িগঙ্গার সমস্যাকে চারটি দিক থেকে চিহ্নিত করছি:

- বুড়িগঙ্গার তীরে এবং অভ্যন্তরের জমি দখল করে স্থাপনা নির্মাণ
- গলিত বর্জ্য ও আবর্জনা দিয়ে নদীর তলদেশ ভরাট

- বুড়িগঙ্গার পানি দূষণ
- নদীর নাব্যতা হ্রাস।

বুড়িগঙ্গার তীরে এবং অভ্যন্তরের জমি দখল করে স্থাপনা নির্মাণ

বুড়িগঙ্গার তীরে এবং নদীর অভ্যন্তরের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের কারণগুলো সাধারণভাবে নিম্নরূপঃ

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশ তথা ঢাকা শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য জীবিকা নির্বাহ ও বসবাসের উদ্দেশ্যে বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর পাড় দখল হয়ে যাচ্ছে।

২. দখলের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা: নদী অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর দুই তীর যত্রতত্রভাবে বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

৩. পরিবহন ও যাতায়াতের সুবিধা: মালামাল পরিবহনের সুবিধা গ্রহণের জন্য বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে।

৪. বর্জ্য ফেলার জায়গা: নদী তীরে গড়ে উঠা বিভিন্ন স্থাপনার বর্জ্যসমূহ বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে ধীরে ধীরে দখল করে নেয়া হচ্ছে।

৫. আয়ের উৎস: নদী দখল করে ঘর নির্মাণ করে বসবাসের জন্য ভাড়া দেয়া, কলকারখানা স্থাপন প্রভৃতি কারণে নদী দখল হয়ে যাচ্ছে।

গলিত বর্জ্য ও আবর্জনা দিয়ে নদীর তলদেশ ভরাট

ঢাকা শহরের নানাবিধ বর্জ্যের মধ্যে আছে তিনশটি বিভিন্ন ধরণের শিল্প কারখানার বর্জ্য। তারই একটি ধরণ হলো হাজারীবাগের পঁচিশ হেক্টর জমির ওপর স্থাপিত দুই শ'র বেশি ট্যানারি। এসব ট্যানারি থেকে প্রায় ১৬,০০০ ঘনমিটার বিষাক্ত তরল ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশিত হয়। একইভাবে তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে প্রায় ১২,০০০ ঘনমিটার অপরিশোধিত বর্জ্য নিষ্কাশিত হচ্ছে। দুই'শ পঞ্চাশটি পলিথিন কারখানা থেকে প্রস্তুতকৃত পলিথিন ব্যাগ প্রতিদিন ঢাকা শহরের ষাট লাখ লোক ব্যবহার করছে। এর শতকরা ৫২ ভাগই একবার ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্য আরেক ধরনের শিল্প হলো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ। ঢাকা শহরে ও আশেপাশে আছে প্রায় হাজার দেড়েক গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ, যার থেকে টুকরো ছেঁড়া কাপড়সহ টনকে টন বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন।

এই সমস্ত কলকারখানার তরল ও কঠিন বর্জ্য সরাসরি নিচু জায়গায়, খাল-খন্দে এবং চারিদিকের নদী বুড়িগঙ্গা-তুরাগ-বালুতে ফেলা হচ্ছে। একটা বিরাট অংশই ফেলা হচ্ছে বুড়িগঙ্গায়। ফলস্বরূপ নদীর পানি মারাত্মক দূষিত তো হচ্ছেই সেই সাথে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমের কামরাঙ্গিরচর থেকে পূর্ব-দক্ষিণের চীন মৈত্রী সেতু পর্যন্ত বিস্তৃত বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে জলযান নোঙ্গর ফেলতে পারছে না। কারণ বছরের পর বছর জমে থাকা গলিত বর্জ্য ও আবর্জনা দিয়ে নদীর তলদেশ প্রায় দশ ফুট পর্য্যন্ত ভরে আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, হাজার হাজার টন আবর্জনা-ময়লা, তৈলাক্ত কাদা জমা হয়ে জলযানের নোঙ্গর আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা নদী হারিয়ে ফেলেছে। এ ছাড়াও প্রতিদিন দশ হাজার ঘনলিটারের বেশি তরল শিল্পবর্জ্য যার মধ্যে কাঁচাবাজার, গৃহস্থালি, শিল্প ও হাসপাতালের বর্জ্য প্রচুর পরিমাণে নদীতে সরাসরি ফেলা হচ্ছে। এর সাথে আছে ঢাকা শহরের এক কোটি লোকের পয়:বর্জ্য যার ২০% ভাগ পরিশোধিত, ৪০% সেপটিক ট্যাংকের মাধ্যমে আংশিক-পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৪০% অপরিশোধিত অবস্থায় নদীতে ফেলা হচ্ছে।

বুড়িগঙ্গার পানি দূষণ

অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য নিক্ষেপ, ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ, মলমূত্র নিষ্কাশন, অন্যান্য নানা প্রকারের দূষণের ফলে পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশ: কমে আসছে। পানিতে মাছ, অন্যান্য প্রাণী ও গাছের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতি লিটারে অন্তত ৪ মিলিগ্রাম দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রয়োজন। অথচ শুকনো মৌসুমে তথা মার্চ থেকে মে পর্যন্ত মিরপুরে ব্রীজ থেকে পাগলা পর্য্যন্ত পানি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৯টি স্থানের পানি জলজ প্রাণী বেঁচে থাকার অনুপযুক্ত।

নদী সংকোচন ও নাব্যতা হ্রাস

বুড়িগঙ্গার বুকে অবকাঠামোর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নদী ধীরে ধীরে সংকোচিত হয়ে আসছে। ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে দিন দিন। নদীর সংকোচন বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৯১ সালে বুড়িগঙ্গার প্রস্থ বর্ষাকালে ২০০ মিটার থেকে ৩৫০ মিটার ছিল। অপরদিকে বর্তমানে বুড়িগঙ্গার গভীরতা দেড় মিটার হ্রাস পেয়েছে।

সামগ্রিক প্রভাব

বুড়িগঙ্গা নদী অবৈধ দখল, পানি দূষণ, তলদেশ ভরাট প্রভৃতির কারণে মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। এই নদী নগরবাসীদের অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র, খাবার পানির উৎস, নৌকা চলাচলের মাধ্যম। কিন্তু বর্তমানে এ সকল সুবিধা থেকে নগরবাসী বঞ্চিত। বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশে তলানী জমে স্থান ভেদে ৫-৬ ফুট আস্তরণ জমেছে। এ তলানীগুলো এত বিষাক্ত যে মাটি পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ড্রেজিং করেও এ তলানী সরানো সম্ভব নয়। এমনকি এসব তলানী যদি কোন স্থানে ডাম্পিং করা হয়, তাহলে ঐ স্থানের মাটির স্বাভাবিক গুনাগুন নষ্ট হবে। ফলে ঐ স্থানে নতুন করে পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। বুড়িগঙ্গার বিভিন্ন স্থানে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতি লিটারে হাজারীবাগে ৫ মি. গ্রাম, চাদনীঘাটে ২ মি. গ্রাম, সদরঘাটে ১ মি. গ্রাম। এ কারণে বুড়িগঙ্গা নদীতে হাজারীবাগ থেকে পাগলা পর্যন্ত কোন মাছ নেই। ট্যানারী শিল্প কারখানার রাসায়নিক ও জৈব পদার্থ বুড়িগঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে নদীর পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহের ভূগর্ভস্থ পানিও দূষিত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও নদীর পাড় দখল হয়ে যাওয়ায় ঢাকা শহরের পানি নদীতে চলে যেতে পারে না। ফলশ্রুতিতে, ঢাকা শহরের নিম্ন এলাকাসমূহে স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এসব আবদ্ধ পানি খুবই নোংরা এবং মশার বংশ বিস্তারের উৎকৃষ্ট স্থান। এ জন্য এ সব এলাকায় মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

বুড়িগঙ্গা দূষণের আরেকটি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে। ঢাকার একমাত্র পানি শোধনাগারে এই নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় এবং মাত্রাতিরিক্ত দূষণের ফলে পানির পরিমাণ এবং গুণগতমান উভয়ের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শোধনের জন্য কেমিক্যাল ব্যবহারের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে দূষণ বাড়তে থাকলে বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্প-কারখানার হেভি মেটাল যার মধ্যে আছে ক্রোমিয়াম, লেড, মারকারি ইত্যাদির মাত্রা বেড়ে গেলে তা শোধন করা বর্তমান শোধন প্রণালীতে সম্ভব নয়। তাই এই মুহূর্তে দূষণ বৃদ্ধির পরিমাণ রোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে এই পানি শোধনাগারটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বুড়িগঙ্গা রক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম

'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন'-এর উদ্যোগে গৃহিত কার্যত্রমে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে নীচে তা পর্যায়ক্রমে ধরা হলো:

- সরকারি কার্যক্রম
- পরিবেশ আন্দোলনের ভূমিকা
- প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা
- নাগরিক সমাজের ভূমিকা

সরকারি কার্যক্রম

বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকারও বুড়িগঙ্গা রক্ষার দাবীতে এগিয়ে আসে। সরকারি কার্যক্রমগুলো মোটামুটিভাবে নিম্নরূপঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বুড়িগঙ্গার আশেপাশে অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে জরিপ পরিচালনা এবং State of the Water Quality of the Buriganga শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।
- সদরঘাট কেন্দ্রিক ঢাকা নৌবন্দর রক্ষার নিমিত্তে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবৈধভাবে বুড়িগঙ্গা দখলকারী ১০৪টি স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলা এবং

এতদসক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দৈনিকগুলোতে প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

- অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে নোটিশ প্রদান করার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক BIWTA-কে দায়িত্ব প্রদান।
- ECNEC কর্তৃক ৬৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন।
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত 'মহানগর পরিবেশ বিষয়ক সমন্বিত নীতিমালা প্রনয়ণ কমিটি' ২০০১ সালে অনেকগুলি সভায় মিলিত হয় এবং এই সকল সভায় সংশি-ষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের প্রধান/ প্রতিনিধি ছাড়াও দেশের স্বনামধন্য পরিবেশবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র নেতৃবৃন্দ (জনাব এম এ মুহিত, প্রফেসার জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম রহমান, আবু নাসের খান) এই সকল সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এইচ. এম. আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির ৯ই মে ২০০১ তারিখের সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তসসমূহের মধ্যে বুড়িগঙ্গা নদী বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ
- বুড়িগঙ্গাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নদী তীরবর্তী জায়গা লীজ প্রদান বন্ধের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হবে;
- বুড়িগঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা চিহ্নিত অবৈধ স্থাপনাসমূহ অপসারণের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- অবৈধ কোন স্থাপনাকে যেকোন ধরণের সেবা প্রদান নিষিদ্ধ করতে হবে;
- বুড়িগঙ্গা নদীর অভ্যন্তরে অবৈধভাবে সৃষ্ট আইল্যান্ড এবং তীরে স্থাপিত ডকইয়ার্ডসমূহ অপসারণের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হবে;
- পাইকারী বাজার/ আড়তসমূহ বুড়িগঙ্গার তীর থেকে সুবিধাজনক স্থানে অপসারণের জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হবে;
- নদীতে যেকোন ধরনের বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধের নিমিত্তে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই BIWTA-এর উদ্যোগে বুড়িগঙ্গার আশে পাশে গড়ে উঠা বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেয়া হয়।

বাপা এবং বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

পরশ ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)' বুড়িগঙ্গা নদীকে অবৈধ দখল ও পানি দূষণ থেকে রক্ষা কল্পে বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তোলে। এ লক্ষ্যে পরশ থেকে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুতে সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয় । তুরাগ নদী সংরক্ষন বিষয়েও কিছু কার্যকরী অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । বুড়িগঙ্গা রক্ষা আন্দোলনের পক্ষ থেকে নৌকা মিছিলের আয়োজন করা হয়, সেনা কল্যাণ সংস্থার সামনে অবৈধ দখলদারীর বিরুদ্ধে অবস্থান ধর্মঘট পরিচালিত হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী ও মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করা হয় এবং নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোজাফ্ফর হোসেন চৌধুরী মায়ার সঙ্গে বাপা'র একটি প্রতিনিধিদলের 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগিতায় খিলগাঁওস্থ বারোগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করা হয়। জাতীয় প্রেসক্লাব হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত এক র‌্যালী ও সমাবেশ এবং 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া, BIWTA কর্তৃক উচ্ছেদকৃত স্থানে (সদরঘাট সংলগ্ন) বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন কর্তৃক বৃক্ষরোপন অভিযান উদ্বোধন করা হয়। সম্প্রতি সেনা কল্যাণ ভবনের সামনে পুনারায় অবস্থান ধর্মঘট ও চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং পরে BIWTA চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপিও পেশ করা হয়। বুড়িগঙ্গা আন্দোলন বুড়িগঙ্গার সার্বিক উন্নয়ন এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য BIWTA সহ সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এবং সহায়তা প্রদান করছে ।

প্রকৃতপক্ষে, বাপা 'ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা বাঁচান' এই শে-াগানকে সামনে রেখে গণসচেতনতা সৃষ্টি, সচেতন সমাজকে সংগঠিত করা, ক্রমাগতভাবে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচী গ্রহণসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লবিং ও আলাপ আলোচনা, সভা, সেমিনার অব্যাহত রেখেছে। বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন আস্তে আস্তে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্রমান্বয়ে তা সারা দেশের নদী বাঁচাও আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে।

প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

সত্যিকার অর্থে, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনকে বেগবান করেছে বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলো। ৪ঠা জুলাই ২০০০ সালে The Daily Star পত্রিকায় সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বুড়িগঙ্গার পাড় শ্যামপুরে প্রায় ২.১৫ একর জমি দখল করে বিল্ডিং গোডাউন ও জাহাজ টার্মিনাল তৈরি সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করার ফলে পরিবেশ সচেতন মানুষের মধ্যে উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা এই উদ্বিগ্নতাকেই আন্দোলনে রূপদান করে। এছাড়া, সকল প্রচার মাধ্যমই বুড়িগঙ্গার বর্তমান চিত্র, অবৈধ দখলের ধরণ, এর সাথে সংশি-ষ্ট ব্যক্তি ও সরকারের ভুমিকা, বুড়িগঙ্গা রক্ষার গুরুত্ব এবং সরকারি পদক্ষেপ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের পদক্ষেপগুলো নিয়মিতভাবে পত্রিকা এবং দেশীয় টিভি অনুষ্ঠানগুলোতে প্রচারিত হওয়ায় একদিকে যেমন আন্দোলনে সম্পৃক্ত কর্মীগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে অন্যদিকে তেমনি বুড়িগঙ্গা রক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক জনমতের সৃষ্টি হয়েছে।

বুড়িগঙ্গার বর্তমান সমস্যাসমূহ

- সম্প্রতি BIWTA কর্তৃক অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলার অভিযান চলছে। ইতোমধ্যেই অনেক স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এখনও ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। এতে জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে । তাছাড়া, ভেঙ্গে ফেলা স্থাপনার অধিকাংশই নদী গর্ভে ফেলার কারণে তা নদীর তলদেশে জমা হয়ে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে। অধিকন্তু উচ্ছেদকৃত স্থানেও আবার নতুন স্থাপনা গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গার সকল অবৈধ স্থাপনা এখনও চিহ্নিত ও উচ্ছেদ করা হয়নি।
- কিছু কিছু দখলদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐ সকল স্থাপনার উচ্ছেদের উপর নিম্ন আদালত কর্তৃক ইনজাংকশন জারী করা হয়। এর ফলে এসকল স্থাপনা ভাঙ্গা সম্ভব হচ্ছে না ।
- নদী ভরাট করে যে সমস্ত স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে তার উপরিকাঠামো ভাঙ্গা হলেও ঐ জায়গা খনন করে নদীর অন্তর্ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা বা উদ্যোগ অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া, উদ্ধারকৃত নদীর পাড় সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের কোন পরিকল্পনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।
- নদীর পানি দূষণ রোধকল্পে শিল্পবর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য, গৃহস্থলিবর্জ্য সহ সকল বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধকরণ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং নদীর সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষায় কোন বাস্তব উদ্যোগ গৃহীত হয়নি ।
- নদীকে কার্যকরী জলপথে পরিণত করা এবং একে জলজ প্রাণীর আবাসস্থলে পরিণত করার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বুড়িগঙ্গা বিষয়ে বর্তমানে করণীয়

বুড়িগঙ্গা আন্দোলনকে আরো কার্যকরী করার লক্ষ্যে নিম্নে উলে-খিত কাজগুলো অতীব জরুরী:

- বুড়িগঙ্গায় ইতোপূর্বে চিহ্নিত অবৈধ স্থাপনাসমূহে অতিদ্রুত উচ্ছেদ সম্পন্ন করা এবং যে সকল অবৈধ স্থাপনা এখনও বিভিন্ন কারণে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি সেগুলো দ্রুত চিহ্নিত করে উচ্ছেদ করতে হবে।
- নিম্ন আদালত থেকে ইনজাংকশন জনিত কারণে যে সকল অবৈধ স্থাপনা অপসারণ সম্ভব হচ্ছে না সেগুলো উচ্ছেদের লক্ষ্যে আইনগত

বাঁধাসমুহ অপসারণ ও উচ্ছেদকৃত ভূমি রক্ষার জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- নদীর অন্তর্ভূক্ত ভরাটকৃত জায়গা পুনরায় নদীকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নদীর পাড়ের যথাযথ ব্যবহারের জন্য উচ্ছেদকৃত স্থাপনা অপসারণের সাথে সাথে নদীর পাড় বাঁধাই, বৃক্ষরোপণ, উন্নয়ন, ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি না করে নদীপাড়ের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- অবৈধ স্থাপনার ভাঙ্গা উপকরণ যাতে নতুন করে কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য অবৈধ স্থাপনার যে সকল ভাঙ্গা উপকরণ নদীতে ফেলা হয়েছে সেগুলো অতিদ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে অবৈধ স্থাপনা নদীতে না ফেলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- পানি প্রবাহ ঠিক রাখা ও বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে নদীর তলদেশ খননের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তলদেশের বর্জ্যসমূহ দ্রুত অপসারণ করতে হবে।
- নদীর পানি দূষণ রোধে শিল্পবর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য, গৃহস্থলিবর্জ্য সহ সকল বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে।
- যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নগরীর চারপাশ ঘিরে নদীসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে সার্কুলার নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

উপসংহার

বুড়িগঙ্গা নদীকে রক্ষা করা আজ সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। এই দাবীকে বাস্তবায়িত করার জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার, অন্যদিকে এর জন্য প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগের সমন্বয় এবং জনগণের অংশগ্রহণ। ❑

লেখক পরিচিতিঃ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন।

ঢাকার বায়ু দূষণ – ঘরের ভেতরের ও বাইরের প্রেক্ষাপট

সিলভিয়া মোর্তুজা

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঢাকার বাতাসে গড়ে প্রায় ১০০০ মেট্রিক টন বর্জ্য যুক্ত হচ্ছে। গবেষণা অনুযায়ী প্রতি ঘন মিটার বাতাসে দশ মাইক্রোগ্রাম দূষণ বৃদ্ধি পেলে ফুসফুসে ক্যান্সারের সম্ভাবনা শতকরা আট ভাগ বেড়ে যায় এবং অন্যান্য হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস ঘটিত রোগের সম্ভাবনা ছয় ভাগ বৃদ্ধি পায়। শিশুদের উপর এর প্রতিক্রিয়া আরও মারাত্মক যা শিশুর অকাল মৃত্যু থেকে শুরু করে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের চিরস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। যদিও কিছুদিন আগে সীসা বিহীন পেট্রোল ব্যবহারের আইন করা হয়েছে এখনও সীসা ঢাকার বায়ুদূষনের অন্যতম প্রধান কারণ। সীসার কনাগুলো খুব সূক্ষ্ম বলে এগুলো শ্বাসযন্ত্রের ভেতরে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে। শরীরে প্রবেশের পর সীসার ৭০ থেকে ৯০ ভাগ বিভিন্ন হাড়ের ভিতর জমা হয় যা কিনা বহু বছর সেখানে সঞ্চিত থাকে এবং স্বাস্থ্যসংকটের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত সীসার কণাগুলো মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ঢাকা শহরে যানবাহনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিশ্ব ব্যাংক বায়ু দূষণরোধকে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের দূষণরোধ বিশেষজ্ঞ পল জে মার্টিন বলেন – সীসা বিহীন জ্বালানী ব্যবহারে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের সাথে সফলভাবে কাজ করছে। যদিও এতে করে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু এখনও ঢাকার বায়ু দূষণের মাত্রা আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী অনেক বেশী। এককালে 'বাগানের শহর' হিসেবে পরিচিত ঢাকার জন্য এটা সত্যিই দুঃখজনক।

ঢাকার বায়ুদূষণের জন্য ৭০ ভাগ দায়ী ছিল টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন, গত সেপ্টেম্বর থেকে যা কিনা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে করে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ কতটুকু হবে তা একমাত্র ভবিষ্যত বলতে পারে।

ঘরের বাইরের বাতাসের মত ঘরের ভেতরের বায়ুদূষণও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। যদিও এ ব্যাপারে আমরা সচেতন নই, তবু ঘরের ভেতরের বাতাস দূষণমুক্ত না রাখতে পারলে তা অনেক মারাত্মক রোগের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ এবং কল-কারখানার বায়ু দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হতে হবে। কারণ এই দূষণ ঘটাতে পারে অসংখ্য মানুষের তীব্র মাথা-ব্যাথা এবং হাঁপানীসহ ফুসফুসের অনেক রোগ।

অন্যদিকে পরিবেশগত এলার্জির অধিকাংশই স্পর্শ এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ শিশুদেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদেরকে বাতাসের স্বাভাবিক দূষিত পদার্থগুলোর হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু ঘরের ভেতরের বাতাসে যে দূষিত পদার্থগুলো থাকে (যেমন কাপড় থেকে আসা কৃত্রিম সুতোর আঁশ, সাবানের কণা, ক্ষুদ্র কীট ইত্যাদি) সেগুলো একদিকে যেমন খালি চোখে দেখা যায় না, অন্যদিকে তারা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হল, এই ধরনের দূষণ দীর্ঘদিন মানবদেহে সঞ্চিত হয়ে বড় কোন রোগ ঘটাবার আগে তাদের উপস্থিতি বোঝা যায় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হ্যান হেইজেন কিছুদিন আগে ঢাকায় এক সেমিনারে এ ব্যাপারে আলোকপাত করেন। তাঁর মতে ঘরের ভিতরের বায়ু দূষণ বাইরের দূষণের চেয়েও মারাত্মক। যদিও এই দূষণ সহজে ধরা পড়ে না কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ সাধারণ বায়ু দূষণের চেয়ে সহজ। বাসার ভেতর ধূমপান না করা হচ্ছে এই দূষণের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ। ধূমপায়ীদের সংস্পর্শে থাকার কারণে তিন বছরের কম বয়সী শিশুদের নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়ে যায়। অবশ্য ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই।

তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি? কিভাবে আমরা বায়ু দূষণ রোধ করতে পারি? এর কোন সহজ উত্তর নেই। কেননা যতদিন না এ ব্যাপারে জনসাধারণ সচেতন হচ্ছেন ততদিন এর থেকে পরিত্রান পাওয়া যাবে না। সচেতনতা বিস্তারের জন্য প্রচার মাধ্যমসহ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমের ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু যেহেতু দূষণ রোধ করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা' অনেককেই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেকে প্রথমে তার বিরোধিতা করবেন। অন্যদিকে এই সমস্যাকে এখনই গুরুত্ব না দিলে তা দিনে দিনে মারাত্মক হয়ে উঠবে। অধিকাংশ মানুষ এখনও মনে করেন যে শুধু সরকারের হাতেই সবকিছুর সমাধান রয়েছে – কিন্তু বায়ুদূষণ রোধের জন্য প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, আর তা করতে হবে নিজের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের বেঁচে থাকার স্বার্থেই। ❑

লেখক পরিচিতি ঃ পরিবেশ কর্মী, ঢাকা।

অনুলিখন ঃ **সালেহীন মনোয়ার রেশাদ**, স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া।

বায়ু দূষণ এবং সিএনজি'র ব্যবহারঃ সুবিধা ও অসুবিধা

মুশফিকুর রহমান ও শরিফা খানম

সূচনা

মানুষের জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে যে তিনটি উপাদান তা হলো ঃ মাটি, পানি আর বায়ু। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ এ তিনটি উপাদান ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট করেছে। তবে, বিংশ শতাব্দিতে নগরায়ণ আর আধুনিক সভ্যতার বিকাশে পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়েছে সবচাইতে বেশি। নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে মানুষ এদিকে আর দৃষ্টি না দিয়ে পারছে না। তবে, মাটি আর পানির পরিবর্তনে মানুষ যতটা সংবেদনশীল, বায়ুমন্ডল কিংবা বায়বীয় উপাদানের পরিবর্তন আমাদের চোখে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান নয় বলে বায়ু দূষণে মানুষ প্রাথমিকভাবে ততটা উদ্বিগ্ন হয়নি। পরিস্থিতির নাজুকতায় মানুষ বাধ্য হয়েই আজ বায়ু দূষণের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশে নানা রোগ ব্যাধি ও নানাবিধ সমস্যার উৎস হিসাবে বায়ু দূষণকে চিহ্নিত করে বিছিন্নভাবে হলেও সাম্প্রতিক কালে কিছু উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সমস্যার গভীরতার নিরিখে তা যথেষ্ট না হলেও বায়ু দূষণ রোধে নাগরিক উদ্যোগ আর সরকারি কার্যক্রম ধীরে ধীর বেগবান হচ্ছে। আর এ প্রেক্ষিতে যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত গ্যাসের মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞগণ সিএনজি (Compressed Natural Gas) চালিত যানবাহন ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন। কেননা, সিএনজি কেবল বায়ু দূষণের ঝুঁকিই কমায় না, এটি পরিবেশ সহায়ক আর অর্থ সাশ্রয়ীও বটে। তাছাড়া, সিএনজি দেশীয় গ্যাস নির্ভর বিধায় একে অন্যতম পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প জ্বালানী হিসাবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে, এর ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে দ্বিমত না থাকলেও বাস্তবে এর ব্যবহার প্রসারে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা।

বায়ু দূষণ কি এবং কেন?

সহজ ভাষায় বায়ু দূষণ হলো বাতাসে ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি যা পরিবেশ, স্বাস্থ্য আর জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। যানবহানের ধোঁয়া, শিল্প কারখানার ধোঁয়া আর বর্জ্য থেকে নির্গত গ্যাস, ইটের ভাটার দূষণ, পোড়ানো কয়লা ইত্যাদি থেকে নির্গত গ্যাস বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, সালফারের অক্সাইড, সীসা, হাইড্রোকার্বন, ওজোন ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

বাংলদেশে দূষণের সকল উৎস এবং তাদের ভূমিকা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য বাস্তবিক পক্ষে নেই। তবে, বিভিন্ন সমীক্ষা এবং সম্প্রতি জাতীয় সংসদ ভবন কমপে-ক্সে স্থাপিত সার্বক্ষণিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, শুকনো মৌসুমে ঢাকা শহরের দূষণভার বর্ষা মৌসুমের চেয়ে অনেক বেশি এবং দিনের চেয়ে রাত্রে ঢাকায় বায়ু দূষণ বিশেষতঃ সালফারের অক্সাইড জনিত দূষণ মাত্রা বেশি হয়। আবহাওয়া ও তাপমাত্রার বৃদ্ধি-হ্রাস ছাড়াও রাতের বেলা অবারিত ট্রাক চলাচল ঢাকার বায়ু দূষণ বাড়ায়। অন্যদিকে, শীত মৌসুমে শুকনো ধূলোবালি, বায়ু তাড়িত হাওয়া আর ঢাকার চারপাশের প্রায় ৪০০ ইটের ভাটার দূষণ বায়ু দূষণে ইন্ধন যোগায়।

এক সমীক্ষা অনুযায়ী সালফারের অক্সাইডজনিত বায়ু দূষণ ঘটে যানবাহনের ধোঁয়া থেকে ৫৫.৮%, ইটের ভাটা থেকে ২৮.৮% এবং অন্যান্য শিল্প কারখানা থেকে ১০.৫% এবং অবশিষ্ট ৫% বুড়িগঙ্গার লঞ্চ ও অন্যান্য উৎস থেকে। একইভাবে নাইট্রোজেনের অক্সাইডজনিত দূষণের সিংহভাগ আসে যানবাহন থেকে (৫৪.৫%), ইট ভাটা থেকে ১৭.৫%, গৃহস্থালী থেকে ৯.৫%; শিল্প কারখানা থেকে ৮.৮%; নৌচলাচল থেকে ৭.৭% এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে ২%। কার্বন মনোঅক্সাইড মূলত নির্গত হয় জ্বালানীর অপর্যাপ্ত দহনের কারণে। এক্ষেত্রে দুই-স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন প্রধান ইন্ধন।

বর্তমান আলোচনা প্রধানত: যানবাহনের মাধ্যমে বায়ু দূষণের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। প্রচলিত যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস ও ভাসমান বস্তুকনা বাতাসে মিশে যানবাহন জনিত বায়ু দূষণ ঘটায়। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের ইঞ্জিন এবং দুই-স্ট্রোক বিশিষ্ট জ্বালানী সম্পূর্ণভাবে ইঞ্জিনে দহন না হলে (incomplete burning) এর ক্ষতিকর উদ্বায়ী গ্যাস ও বস্তুকনা বাতাসে মিশে বায়ু দূষণের সৃষ্টি করে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি আর সেই সাথে যানবাহনের সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়ে আজ অনেকটা অসহনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বাতাসে ভাসমান বস্তকনা (Suspended Particulate Matter - SPM) ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা শহরের বাতাসে বিদ্যমান SPM এর মাত্রা হ্রাস করে বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ডে নামিয়ে আনতে পারলে বৎসরে ৩,৫৮০ টি অকাল মৃত্যু রোধ করা, ১০ মিলিয়ন কর্মদিবস শ্রম বৃদ্ধি করা এবং ৮ মিলিয়ন শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বলে Urban Transport and Environment Improvement Study Summary Report (আগস্ট, ২০০১) তথ্য প্রকাশ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ড অনুযায়ী দেশের চারটি প্রধান ব্যস্ত শহরে (ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা গেলে দেশে বছরে প্রায় ১৫,০০০ অপমৃত্যু রোধ করা সম্ভব। একই সাথে বায়ু দূষণ হ্রাস পেলে প্রায় সাড়ে ছয় মিলিয়ন চিকিৎসা সেবা গ্রহণে বাধ্য রোগী, সাড়ে আটশত মিলিয়ন বাধ্যতামূলক কম কর্মঘন্টার দিন এবং মানুষের জীবনে বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়াও সম্ভব। এর আর্থিক সাশ্রয়ের দিকটি অবশ্যই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

রোড নেটওয়ার্ক, যানবাহনের ধরণ (বিশেষ করে রিক্সার মত ধীর গতি সম্পন্ন যানবাহন) এবং অনুন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কারণে ঢাকা শহরে যানবাহন জনিত বায়ু দূষণের মাত্রা তুলানামূলকভাবে বেশি। ২-স্ট্রোক বিশিষ্ট যানবাহন থেকে PM10 (১০ মাইক্রোনের চেয়ে সূক্ষ্ম বায়ুকণা), CO (কার্বন মনোক্সাইড) ও HC (হাইড্রোকার্বন) বেশি নির্গত হয়। অন্যদিকে, বাস/ট্রাক থেকে NO_x (নাইট্রোজেনের বিভিন্ন ধরনের x পরিমানের অক্সাইড যৌগ সমূহ) এবং SO_x (সালফার অক্সাইড সমূহ) তুলানামূলকভাবে বেশি নির্গত হয়। তবে, আশার কথা হচ্ছে, সরকার ১লা সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে তিন চাকা ২-স্ট্রোক বিশিষ্ট যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। বাস্তবে তা কার্যকর করা সম্ভব হলে ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ মাত্রা অনেকখানি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বায়ু দূষণ কেবল যানবাহনের ধরণের উপর নির্ভর করে তা নয়, যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানীও বায়ু দূষণের জন্য দায়ী। সরকার ২০০০ সাল থেকে সীসাযুক্ত পেট্রোল আমদানি বন্ধ করায় বাতাস সীসামুক্ত করা সম্ভব হলেও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ এখনও আশংকাজনক মাত্রায় বাতাসে বিরাজ করছে। ঢাকা শহরে SPM এর মাত্রা বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ডের তুলনায় ২ থেকে ৪ গুণ বেশি আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ডের তুলনায় প্রায় ১২ গুণ বেশি। তদ্রুপ ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে SO_x এর মাত্রা দেশীয় মানদন্ডের চাইতে ৫ গুণ এবং WHO এর নির্দেশিকার চাইতে প্রায় দশগুণ বেশি। এর প্রভাব যে কতটা ভয়াবহ তা যে কোন সচেতন নাগরিকের কাছে সহজেই বোধগম্য।

ইতোমধ্যেই ক্যান্সার, হাঁপানি এবং শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য কয়েকটি মারাত্মক রোগের অন্যতম কারণ হিসাবে বায়ু দূষণকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, বায়ু দূষণের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ অত্যন্ত আপেক্ষিক একটি বিষয়। দেশ-কাল-স্থান ভেদে তা অবশ্যই ভিন্নতর হবে। আর, এক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হলো যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপের ন্যায় উন্নত বিশ্বে যত সংখ্যক লোক সরাসরি দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে আসে আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে তার চাইতে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক লোক দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে আসে। ঢাকা শহরের ৬২% লোক মূলত পায়ে হেঁটে চলাচল করে, যা উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া, যারা অন্যান্য যানবাহনে চলাচল করে তারাও দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। ফলে বায়ু দূষণের প্রভাব আমাদের উপর বেশি পড়ে। একই কারণে শহর/লোকালয়ের চারপাশে আপাত: বিবেচনায় বায়ু দূষণ আশংকাজনক মনে না হলেও নির্দিষ্ট দূষণ উৎসের সরাসরি সংস্পর্শে থাকায় মানুষ অধিক মাত্রায় দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবে আক্রান্ত হয়।

যানবাহন জনিত বায়ু দূষণ রোধে একদিকে যান বাহনের প্রকৃতির উপর যেমন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, সেইসাথে জ্বালানীর ব্যবহারের প্রকৃতি পরিবর্তন করাও আবশ্যক। তদুপরি, আমাদের দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আইন প্রয়োগ দ্বারা জ্বালানীর মানদন্ড নিশ্চিত করার মত অপ্রত্যক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ ততটা ফলপ্রসূ নয়। তাই আমাদেরকে প্রত্যক্ষ কৌশল অবলম্বন করে সমস্যার গোড়া বা উৎসতেই তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে সিএনজি'র ব্যবহার প্রসারের উদ্যোগ অগ্রাধিকারের দাবী রাখে।

সিএনজি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

দূষণমুক্ত জ্বালানী হিসাবে বিভিন্ন দেশে বহু আগেই সিএনজি'র প্রচলন হয়। অর্থ সাশ্রয়ের বিবেচনায়ও অনেকে সিএনজি চালিত যানবহন ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছে। জাপানে সিএনজি ব্যবহারের তুলানামূলক খরচ ডিজেলের তুলনায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশের বিবেচনায় এখানকার জনগণ সিএনজি ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছে। মূলতঃ নিম্নবর্ণিত কারণে সিএনজিকে বিকল্প জ্বালানী হিসাবে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে ঃ

একঃ সিএনজি পরিবেশ সহায়ক একটি জ্বালানী। প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদানগুলো হচ্ছে – মিথেন ৯১% (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৯৫-৯৭%), ইথেন ৩.৭%, কার্বন ডাই-অক্সাইড ২%, প্রোপেন ১.২%, আই-বিউটেন ০.৪%, এন-পেনটাইন ০.২%, নাইট্রোজেন ০.২%। সিএনজি জ্বালানী পোড়ালে পেট্রোল পোড়ানো গাড়ির চেয়ে কার্বন মনো-অক্সাইড ৭৪%, হাইড্রো কার্বন ৭০% এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড ৮৫% কম নির্গত হয়। ফলে অন্য যেকোন জ্বালানীর তুলনায় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে কম পরিমাণে দূষিত পদার্থ নির্গত হয়। তদুপরি, সিএনজি সালফার কিংবা সীসাযুক্তও নয়। ডিজেল চালিত বাসের তুলনায় সিএনজি চালিত বাসে CO ৫৬%, HC ৫৫%, NO_x ৫৬%, SPM ৮৬% কম নিঃসরণ হয়। সিএনজি চালিত যানবাহন থেকে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (কার্সিনোজিনিক) উপাদান নির্গত হয় না।

দুইঃ সিএনজি'র পরিবহণ, পরিশোধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা রূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে না। এতে কেবলমাত্র বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক থেকে উচ্চ চাপে (৩০০০ pounds per square inch-psi) গ্যাস সংকুচিত করে গাড়ির ভিতরের সিলিন্ডারে ভর্তি করতে হয়।

তিনঃ সিএনজি চালিত যানবাহনে জ্বালানী খরচ অনেক কম। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি ঘন মিটার সিএনজি এর মূল্য ৭.৪৫ টাকা (এক ঘনমিটার সিএনজি ১.২৩ লিটার পেট্রোল কিংবা ১.৬ লিটার ডিজেলের সমপরিমাণ জ্বালানী সরবরাহ করতে পারে), প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য ২৮.০০ টাকা এবং প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ১৭.০০ টাকা। বাস্তবে প্রতি লিটার পেট্রোলের সমপরিমাণ সিএনজি'র মূল্য ৬.০৫ টাকা এবং প্রতি লিটার ডিজেলের সমপরিমাণ সিএনজি'র মূল্য ৪.৬৫ টাকা। সুতরাং পেট্রোলের তুলনায় এক্ষেত্রে প্রায় ৭০-৭৫% জ্বালানী ব্যয় সাশ্রয় হয়। উলে-খ্য যে, ডিজেল চালিত যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা বিদ্যমান প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয় বিধায় এক্ষেত্রে জ্বালানী ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে, নতুন গাড়ি ক্রয় কিংবা আমদানির ক্ষেত্রে যানবাহন নির্বাচনের সময় এটি অবশ্যই একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

চারঃ সিএনজিতে রূপান্তরিত মোটরগাড়ি একই সাথে পেট্রোলেও চালানো যায়। তবে, সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে কেবলমাত্র সিএনজি জ্বালানী ব্যবহার উপযোগী মোটরগাড়ি তৈরি ও ব্যবহার শুরু হয়েছে।

পাঁচঃ সিএনজি ব্যবহারে জ্বালানীর অপচয় এবং চুরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই (অবশ্য, সিএনজি ট্যাংকে ভর্তি না করে বিল জমা দেয়ার যে প্রবণতা সম্প্রতি ড্রাইভার ও পাম্প ষ্টেশন কর্মীরা তৈরি করছে তা একান্তই এ দেশীয় আবিষ্কার)।

ছয়ঃ যে কোন প্রতিকূল আবহাওয়া/পরিস্থিতিতে (যেমন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আন্তর্জাতিক বিরূপ পরিস্থিতি) প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

সাতঃ সিএনজি চালিত মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম এবং ইঞ্জিনের স্থায়ীত্ব তুলানামূলকভাবে বেশি হয়। সিএনজি চালিত গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ অনেক কম হয়। ফলে শব্দ দূষণও হ্রাস পায়।

সিএনজি ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ

একঃ সিএনজি চালিত যানবাহনে অতিরিক্ত সিলিন্ডার সংযোজন করতে হয়। ফলে এসকল যানবহানকে অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হয় এবং মোটর গাড়ির মালামাল পরিবহণের স্থানের অপচয় হয়। তবে, ভারী যানবাহন যেমন, ট্রাক, বাস ও ট্রাঙ্কার-এ এই সমস্যা নেই।

দুইঃ পেট্রোল ইঞ্জিনের তুলনায় ডুয়েল-ফুয়েলে (পেট্রোল-সিএনজি উভয় জ্বালানী ব্যবহার উপযোগী) চালিত মোটরগাড়ির ইঞ্জিন ১০-১৫% কম দক্ষতায় চলে।

তিনঃ মোটর গাড়িকে সিএনজিতে রূপান্তরের জন্য যানবহানের মালিককে অতিরিক্ত ২২,০০০-৩০,০০০ টাকা (যানবহনের প্রকৃতি অনুযায়ী) খরচ করতে হয়।

চারঃ পেট্রোল, ডিজেল কিংবা প্রচলিত অন্যান্য জ্বালানীর ন্যায় সিএনজি সাধারণ জনসাধারণের নিকট জ্বালানী হিসাবে এখনও ততটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এক্ষেত্রে সচেতনতার অভাবই প্রধান প্রতিবন্ধক।

পাঁচঃ সিএনজি'র ক্ষেত্রে গ্রাহক সেবা ততটা সহজলভ্যও নয়। বিশেষত: প্রত্যাশিত স্থানে সিএনজি রিফুয়েলিং ষ্টেশন না থাকায় রিফুয়েলিং করা এখনও বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ বিষয়।

ছয়ঃ গ্যাস সিলিন্ডারে কোন ছিদ্র থাকলে যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এজন্য সিলিন্ডারের যথার্থতা সম্পর্কে অবশ্যই সিএনজি গাড়ি ব্যবহারকারীদের নিশ্চিত হতে হয়। নিউজিল্যান্ডে এরূপ কিছু দুর্ঘটনা ঘটায় সিএনজি'র ব্যবহারে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

সিএনজিতে রূপান্তর কৌশল এবং রূপান্তর ব্যয়

সিএনজি ব্যবহারের জন্য যানবহনে সিএনজি ধারণের জন্য সিলিন্ডার সংযোজন করতে হয় এবং মোটরগাড়িকে সিএনজি চালিত বহন উপযোগী করে নিতে হয়। এর জন্য যানবাহনের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য ব্যয় হয় ২২,০০০-৩০,০০০ টাকা। সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাসকে ৩,০০০-৩,৬০০ পিএসআই চাপে সিএনজিতে রূপান্তরিত করে গাড়ির ভিতরে সংযোজিত সিলিন্ডারে প্রবেশ করানো হয়। ফলে ঘনীভূত গ্যাস এতে সঞ্চিত হয়। জ্বালানী তেল যে পথ দিয়ে সরবরাহ করা হয় সে স্থানে একটি ভাল্‌ভ সংযুক্ত থাকে। এই ভাল্‌ভের মাধ্যমে সিলিন্ডারের মধ্য থেকে গ্যাস নির্গত হয়ে এক বা একাধিক চাপ নিয়ন্ত্রকের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যার ফলে গ্যাসের চাপ ক্রমান্বয়ে কমে আসে। গ্রহণীয় চাপে জ্বালানী মোটরগাড়ির দহন চেম্বারে পৌঁছুলে তা পেট্রোলের মতই জ্বলে এবং শক্তি উৎপাদন করে গাড়িকে চলমান রাখে। এক্ষেত্রেও তরল জ্বালানীর মতই রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে এবং সেখান থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে

রূপান্তরিত হয়ে গাড়ি চলে। সিএনজি তরল জ্বালানীর চেয়ে ভালভাবে দহন হয়। ফলে ইঞ্জিন ও জ্বালানীর দক্ষতা বাড়ে এবং দূষণ উলে-খযোগ্য হারে হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে সিএনজি ব্যবহারের যৌক্তিকতা

নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশে সিএনজি ব্যবহারের বিশেষ যৌক্তিকতা রয়েছেঃ

একঃ সিএনজি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত অন্য যে কোন জ্বালানীই আমাদেরকে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

দুইঃ আমাদের দেশের একটি বিশাল এলাকা ইতোমধ্যে গ্যাস নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। ফলে দেশব্যাপী সিএনজি'র প্রসারের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অনেকটুকুই ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে।

তিনঃ সিএনজি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, তেমনি এর ব্যবহার প্রসারের দ্বারা আমরা জ্বালানী আমদানি খরচ বিপুল পরিমাণে কমিয়ে আনতে পারি। উলে-খ্য যে, ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে এদেশে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪,৫৬০ কোটি টাকার জ্বালানী তেল আমদানি করা হয়েছে। দেশের পেট্রোল ও অকটেন চালিত যানবাহনের ৪০-৫০ ভাগ মোটর গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করা সম্ভব হলে জ্বালানী তেল আমদানি ব্যয় শতকরা ২৫-৩০ ভাগ হ্রাস করা সম্ভব। তাছাড়া, দেশের গ্যাস সম্পদ ব্যবহারের বাজার সম্প্রসারণেও তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

চারঃ বর্তমানে বায়ু দূষণ যে মাত্রায় পৌঁছেছে তা প্রতিরোধ কল্পেও সিএনজি'র ব্যবহার সম্প্রসারণ বিশেষ অগ্রাধিকারের দাবী রাখে।

উপসংহার

আমাদের দেশের বায়ু দূষণের মাত্রা এবং মানুষ, পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করে আমাদেরকে এখনই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে আমাদের নীতি ও পরিকল্পনার কোন অপ্রতুলতা নেই। সমস্যা হচ্ছে তা বাস্তবায়নের। এদেশের মূল সমস্যা হচ্ছে আমাদের মন ও কর্মকান্ড সুশৃংখল নয়। অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের রাস্তাঘাট ততটা সংকীর্ণ নয়। ট্রাফিক ও অন্যান্য সেবা প্রদান কারী সংস্থা সমূহের মধ্যে শৃংখলা ও সমন্বয়ের অভাবই আমাদের দেশের ট্রাফিক সমস্যার মূল কারণ। এ বক্তব্য যে কেবল আমাদের ট্রাফিক আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়। দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। তবে, বায়ু দূষণ রোধে সরকারের পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা না গেলে আর দেশের সার্বিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে না পারলে কবি মহাদেব সাহার মত আমাদেরকেও হয়ত বলতে হবে, "শহরে বৃষ্টি এলে গলে পড়ে সব ময়লা, কফ, বিভিন্ন অসুখ তুষার জলে বড়ো হয়, মাধবী তুমি বাইরে এসো না, সেই ভালো আমার জীবনে তুমি সুবিখ্যাত হয়ে থাকো আজ।" তবে, জীবন-জীবিকার তাগিদে আমাদেরকে বের হতেই হবে। তাই, যে-কোন মূল্যে আমাদেরকে বায়ু দূষণ রোধে এগিয়ে আসতেই হবে। জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস ভুলে আমাদের জীবন আর ভবিষ্যত বংশধরদের রক্ষার জন্য আমাদেরকে বায়ু দূষণ রোধে একত্রিত হতে হবে। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে তা অসম্ভব কিছু নয়। ❑

লেখক পরিচিতিঃ
ড. মুশফিকুর রহমান ঃ পরিবেশ কর্মী, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)।
শরিফা খানম ঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

লেখাটি বাপা কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সেমিনারে (আগষ্ট ২১, ২০০২) উপস্থাপিত প্রবন্ধের সংক্ষেপিত অংশবিশেষ।

জনসংখ্যার দূষণে জর্জরিত নগরী ঢাকা

আতিকুর চৌধুরী

সুজলা সুফলা এই সেই বাংলা যে বাংলাকে দেখে কবির কবিতায় ভালবাসা উথলে উঠেছিল একদিন – 'ও আমার বাংলা মায়ের রূপের সুধায়....' অথবা সেই

'কাকের চক্ষুর মতো কালো চুল এলিয়ে
পানিতে পা ডুবিয়ে পানিতে পা ডুবিয়ে
রাঙ্গা উৎপল যার উপমা
হৃদয় ছুয়ে যাওয়া নিলাম্বরিতে দেহ ঘিরে যে দেহের উপমা - স্নিগ্ধ তমাল
সে আমার বাংলা - পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।'

সেই বাংলার যৌবনে যেন ভাটা পড়েছে এখন। একদিনের সেই অপরূপ রূপ এখন চাপা পড়ে গেছে শহরে বন্দরে রাস্তায় ডিজেলের কালো ধোঁয়ায় আর ধুলি ধুসরিত পথে দিনে দিনে বেড়ে ওঠা পথচারীদের আধিক্যে। দেশের গ্রামে গঞ্জে, উপশহরে তেমন কোন নতুন কল কারখানা গড়ে ওঠেনি, যার ফলে রুজি রোজগারের তাগিদে হাজার হাজার মানুষ গ্রাম, বন্দর, ছোট শহর থেকে পাড়ি জমিয়েছে ঢাকা শহরের দিকে। যার পরিণামে বেড়ে গেছে ঢাকার পথে হাজার হাজার পথচারীর পায়ের চাপে ফুলে উঠা ধুলো। পথ চলতে গিয়ে মানুষের ভিড়ের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। রাস্তার পাশে ফেলে রাখা আবর্জনা স্তূপের গন্ধে পেটের ভেতর থেকে সবকিছু বেরিয়ে আসতে চায়। শহরতলিতে বস্তির সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে উঠছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিন-এনে-দিন-খাওয়া মানুষের সংসার আরও বড় হচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজে এখনো তেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেনি। পথে পথে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে।

প্রায় দুই যুগ আগে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পপুলেশন সেন্টার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, দিনে দিনে ঢাকা শহরের অধিবাসীদের সন্তান উৎপাদন হার কমিয়ে আনলেও ২০০৩ সাল নাগাদ শহরের অধিবাসী সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেছিলেন, ২৪ বছরে ঢাকা শহরের সমান আকারের আরও ২৯টি শহর একত্রিত করা হলে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ধাক্কা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এই জরিপ প্রকাশিত হবার পর দীর্ঘ দুই যুগ পার হয়ে এসেছি, ঢাকার জনসংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সত্যি, কিন্তু শহরের আকারের কি তেমন উলে-খযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে? বাংলাদেশ বিশ্বের জনাকীর্ণ দেশগুলোর মধ্যে ৮ নম্বর। প্রায় ১৩৩ মিলিয়ন মানুষ ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইলের এই ছোট দেশটাতে থাকে। সারাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ২,৪০১ জন। বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন ১.৮%, বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে ২০২৫ সালে সারাদেশে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৮০ মিলিয়ন, এবং ২০৫০ এ হবে ২০৮ মিলিয়ন।

বর্তমান জনসংখ্যার ৪০%-এর বয়স ১৫-এর নিচে। (তথ্য USAID Bangladesh)। এই কিশোর জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাবে অবশেষে পাড়ি দেয় ঢাকার উদ্দেশে। এই ভাগ্যান্বেষী কিশোর বা তরুণ সম্প্রদায়ের একটা ছোট অংশ ঢাকায় আসে পড়াশোনার তাগিদে, বড় অংশটা আসে জীবিকার তাগিদে। জরিপে দেখা গেছে, ঢাকার জনসংখ্যার ৫০% দরিদ্র, মাসিক গড়পড়তা পারিবারিক আয় ৩৫০০ টাকা। এই পর্যায়ের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় যেমন আবাসিক বিদ্যুৎ, পরিস্কার পানি, গ্যাস, স্যানিটারি ল্যাটট্রিন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে দরিদ্রতা আরও বাড়ছে দিনে দিনে।

১৯৫১ সালের ঢাকা ছিল একটা ছোট শহর, ৩.৫ মিলিয়ন অধিবাসী নিয়ে। অক্টোবর ১৪, ২০০২ ইউএনবি রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি তিন বছরে ঢাকার জনসংখ্যা এক মিলিয়ন করে বৃদ্ধির কারণে রাজধানী ঢাকা ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ৪র্থ জনবহুল শহরে পরিণত হবে। The World Habitat-এর অক্টোবর ৭ সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে ১০ মিলিয়ন অধিবাসী নিয়ে ঢাকা এখন বিশ্বের ১১তম জনবহুল শহর, তবে UNFPA রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকার বর্তমান জনসংখ্যা ১২.৩ মিলিয়ন। UNFPA রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বাৎসরিক শতকরা ৫.৫ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সাল নাগাদ ঢাকার জনসংখ্যা ২১.৩ মিলিয়নে পৌঁছে যেতে পারে।

প্রতি বছর ঢাকার জনসংখ্যার খাতায় ৩০০,০০০ লোক যোগ হয়। এই অতিরিক্ত জনগণের বাসস্থানের প্রয়োজন বাৎসরিক ৭০,০০০ ইউনিট। অথচ গত দশ বছরে ২৫৪ জন প্রাইভেট ডেভেলপারের উদ্যোগে শেষ হয়েছে মাত্র ৪৫০টি প্রজেক্ট যা কেবলমাত্র ১২,০০০ লোকের বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এক তথ্য অনুযায়ী, আরো ৪৫০টি প্রজেক্টে কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে।

আজকের ঢাকায় বিভিন্ন সার্ভিসের আওতাধীন নগরবাসী

পানি সরবরাহ -	৬৩%
স্যুয়োরেজ -	৪৩%
বিদ্যুৎ -	৭৪%
টেলিফোন -	২৩%
সেপটিক ট্যাঙ্ক -	৪০%
পিট ল্যাট্রিন -	১৫%
খোলা ল্যাট্রিন -	৩০%

ঢাকার বাইরে থেকে আসা গ্রামের দরিদ্র সম্প্রদায়ের জনগণ রাজধানীর ১৬০ বর্গমাইল জায়গার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় ৩,০০০ বস্তির কোন অংশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। World Habitat Day-র অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি জরিপ অনুযায়ী ১৯৯১ সাল থেকে এ ধরনের বস্তির অধিবাসীদের বৃদ্ধির হার প্রায় ৬ শতাংশ। মোটামুটি ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০-এর মত মানুষ প্রতিবছর শহরের বিভিন্ন বস্তিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। বর্তমানের এ ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে ওঠা বস্তিতে প্রায় ২ মিলিয়নের মত মানুষ বসবাস করছে। যে হারে রাজধানীর জনসংখ্যা বাড়ছে, কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র শহরের ৬২.৯৪ ভাগ অধিবাসীকে পানির সরবরাহ করতে সক্ষম। অর্থাৎ ৪৭.০৩ ভাগ অধিবাসীর পানি পাওয়ার কোন সরাসরি ব্যবস্থা নেই। স্যানিটারি ব্যবস্থা এই বস্তি গুলোতে অত্যন্ত নিম্নস্তরের, আবর্জনা নিষ্কাশনের কোন সুব্যবস্থা নেই। স্যাঁতস্যাতে পঁচা ডোবা, দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনার স্তুপের পাশে ছোটখাট জায়গা নিয়ে বসবাস করে ঢাকার নতুন অধিবাসীরা দরিদ্রতার নিম্নস্তরে থেকে। কোন ভবিষ্যতের চিন্তা নেই মাথায়, শুধু দিন-এনে-দিন-খেতে-পারার মধ্যেই ওরা শান্তি খুঁজে নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

বাংলাদেশ সিটি কর্পোরেশন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বস্তি এলাকাগুলোর উন্নয়নের জন্য একটি প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে। সেনিটারি ব্যবস্থার উন্নতি, পানির সরবরাহ ও আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এই প্রজেক্টের আওতায় রয়েছে। অপেক্ষায় রইলাম এই আশায় যে, একদিন দেশের অন্যান্য শহরগুলোর উন্নতি হবে, ফলে গ্রাম-গঞ্জ থেকে হাজার হাজার মানুষের ঢাকায় পাড়ি দেয়ার উৎসাহে ভাটা পড়বে। সেই সাথে ঢাকা শহরের দূষিত হাওয়া দিনে দিনে বিশুদ্ধ হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা থেকে বিশেষ বিশেষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দূরে সরিয়ে নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং আধা সরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানকেও ধীরে ধীরে ঢাকার অদূরে সরিয়ে নেয়া যেতে পার। ঢাকার অদূরে উপশহর গাজীপুর এই পরিকল্পনায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। ঢাকায় বসবাসকারী বর্তমান অধিবাসীদের সুবিধার্থে শহরের পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের কথা ভেবে ও সেই সাথে পারিবারিক আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে পরিকল্পিত পরিবার গড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলেই হয়তো একদিন ঢাকার বুকে পা রেখে মানুষ বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। বুকের মধ্যে ভরে উঠবে এক নিবিড় প্রশান্তি। ভাল লাগবে, জনসংখ্যার দূষণ, ডিজেলের ধোঁয়া আর কলকারখানার দূষিত হাওয়ার অনুপস্থিতির কারণে কোন একদিন আবার সেই রমনা বটমূলে প্রাণভরে শ্বাস নিতে। নিশ্চয়ই সেদিন আবার ফিরে আসবে। ❑

পোর্টল্যান্ড, অরেগন।

ঢাকার জনপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ও বায়ুদূষণ রোধে বিভিন্ন প্রকল্পের সমীক্ষা

মোঃ মাসুদ করিম

দুঃসহ যানজট ও অস্বাস্থ্যকর দূষিত বায়ু ঢাকার নগর জীবনের গুণগত মানের মারাত্মক অবনতি ঘটিয়েছে। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য যে সকল সাহায্য সংস্থা এগিয়ে এসেছে তাদের প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য নিতান্তই সীমিত। নগর জনপরিবহণ ব্যবস্থা ও বায়ুর মানের সর্বিক উন্নয়নের জন্য তাই প্রয়োজন যোগাযোগ অবকাঠামোর চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক সমীক্ষা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ট্রাফিক প্রবাহের মূল্যায়ণ ও পরিবেশ সাশ্রয়ী জন-যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। আশা করা যায় যে শেষোক্ত প্রকল্পটি যানজট ও যান থেকে নির্গত দূষণের মাত্রা কমিয়ে নগর জীবনকে আবার সহনীয় করে তুলবে।

ঢাকার নাগরিক পরিবহনে ব্যবহৃত যানগুলি হল বাস, মিনিবাস, প্রিমিয়াম বাস, ট্যাক্সি টেম্পো, অটো রিক্সা, রিক্সা ও শহরতলী থেকে আসা কমিউটার ট্রেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র বাস, মিনিবাস ও রেলই বলা যেতে পারে সুলভ। বাদবাকী যানসমূহ সুলভ তো নয়ই, ব্যাপক যাত্রী বহন করবার ক্ষমতাও তাদের নেই। ঢাকার মধ্যে যাতায়াতের মূল মাধ্যম এখনও হাঁটা (শতকরা ৬০ ভাগ) তারপর রিক্সা ও বাস। তবে কিলোমিটার হিসাবে বাস ৪০%, অটোরিক্সা ২২%, রিক্সা ১৫% ও গাড়ি ১২% ভাগ যাত্রী বহন করে। বিভিন্ন শ-থ ও দ্রুতগামী যানের এই অদ্ভুত মিশ্রণ ঢাকার ট্রাফিক সমস্যাকে জটিল করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নমান, জনসংখ্যা ও যানের ক্রমন্বয় বৃদ্ধি, উন্নত রাস্তার অপ্রতুলতা ও চালকদের শিক্ষার অভাব।

সীসাযুক্ত তেল, ক্যাটালাইটিক কনভার্টারের অপর্যাপ্ত ব্যবহার, দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন, পুরানো গাড়ির ব্যবহার, ডিজেলে সালফার ও বায়ুতে ধুলার উপস্থিতি

দূষণকে এমন মারাত্মক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, ঢাকা এখন বিশ্বের অন্যতম দূষিত নগরীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই নগরীর এখনও কোন দীর্ঘমেয়াদী জনপরিবহণ কর্মসূচী নেই; আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সরকার এখনও বায়ুর গুণগত মাত্রা নির্ধারণের জন্য নির্দেশনাবলী প্রণয়ন করেন নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থা বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বায়ুর মানবৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পকে সমর্থন করছে। এ ধরনের কয়েকটি প্রকল্পকে আমি নিচে বর্ণনা করছি।

Dhaka Urban Transportation Project (DUTP)

বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানপ্রাপ্ত DUTP প্রকল্পটি ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট। এ ছাড়া পরবর্তী কুড়ি বছরের নগর পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানে নীতিপ্রণয়ন ও বাস্তবায়নও DUTP করবে। আনুমানিক ২৩৭ মিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পের ১৫০ মিলিয়ন ডলার নির্ধারিত হয়েছে পূর্ত কাজের জন্যে। তিন পর্যায়ের এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক সার্ভে ও নীরিক্ষা, ডিজাইন ও ডকুমেন্ট তৈরী ও দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক ও পরিবেশ সাশ্রয়ী যোগাযোগ স্ট্র্যাটেজী রচনা।

Air Quality Management Project (AQMP)

এই প্রকল্পটি বায়ুর গুণগত মান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ, দূষণ সংক্রান্ত তথ্যের মূল্যায়ন ও বিতরণ ও দুই স্ট্রোক ও ডিজেল চালিত যানসমূহের দূষণ রোধের কারিগরী উদ্ভাবনের পাইলট প্রজেক্ট প্রণয়ন করবে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের ট্রেনিংও এই প্রকল্পের অন্তর্গত। সার্বিকভাবে দূষণ সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানো এর উদ্দেশ্যে।

Sustainable Environment Management Project (SEMP)

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এটি UNDP-র ২৫ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প। SEMP কয়েক বছর আগে সরকার গৃহীত National Environmental Management Action Plan (NEMAP) এ বর্ণিত পদক্ষেপগুলি কার্যকরী করার জন্য সৃষ্ট। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে একটি প্রকল্পের অধীনস্থ করা SEMP এর উদ্দেশ্য। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন, স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশ, পূর্ত ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিকাশ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও ট্রেনিং এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

Bangladesh Environmental Management Project

কানাডা সরকারের CIDA-র ১২ মিলিয়ন কানাডীয় ডলারের অনুদানে সৃষ্ট এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বাড়ানো। প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, পরিবেশ আইনের মূল্যায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রোগামও এই প্রকল্পের অন্তর্গত। দুই স্ট্রোক অটোরিক্সাকে CNG (compressed natural gas) দ্বারা চালানোর একটি পাইলট প্রজেক্ট এই প্রকল্প গ্রহণ করে।

Study on the Improvement of Transportation and Environment in Dhaka :

Japan Bank for International Co-operation-এর অনুদানে সৃষ্ট এই প্রকল্পটি ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো এবং বায়ুগুণের অবস্থা যাচাই করবে। জাপান সরকার পরিবেশ উন্নয়নে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করতে পারে সেটা নির্ধারণও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পটি CNG চালিত বাসরুট সৃষ্টি করা যায় কিনা সেটাও দেখছে, সেই রুটে CNG স্টেশনও বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

Urban Transport and Environment Improvement

Asian Development Bank (ADB) এর অনুদান প্রাপ্ত এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের (BRTC) একটি উদ্যোগ। এটাকে বলা হয় কারিগরী সহায়তার প্রজেক্ট। এই সহায়তার উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) যারা বায়ু দূষণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা, (২) দূষিত জ্বালানীকে বিতাড়িত করে প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক পরিস্কার জ্বালানী ব্যবহারের জন্যে কর্মসূচী প্রণয়ন করা, (৩) যানবাহনের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মাবলীকে সমীক্ষা করে তার বাস্তবায়ন করা এবং (৪) নগর যোগাযোগ ব্যবস্থায় দূষণ কমাতে ভূমিকা নির্ধারণ করা।

ভবিষ্যত কর্মসূচী

DUTP আপাততঃ UNDP সমর্থিত Dhaka Integrated Transport Study (DITS)-র ফলাফলকে বাস্তবায়ন করছে। DITS ১৯৮৮-র ট্র্যাফিক ও যাত্রী সার্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরী। কিন্তু ঢাকার বর্তমান জনসংখ্যা ও নতুন উৎস/গন্তব্য পরিবহণ ডাটা (Data)-এর উপর ভিত্তি করে DITS-এর পুনর্বিবেচনার দরকার। দূষণ সমাধানের কয়েকটি ভবিষ্যত কর্মসূচি কি হতে পারে তার উলে-খ নীচে করছি ঃ

১. CNG-র ব্যবহার ঃ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কম্প্রেসড প্রাকৃতিক গ্যাসকে যানবাহনের মূল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা অর্থনৈতিকভাবে একটি সম্ভাব্য সমাধান। ঢাকায় এখন ১২০০-র বেশী CNG চালিত গাড়ি ও একটি BRTC-র দোতলা বাস চলছে। ৫টি CNG পাম্প স্টেশনও রয়েছে। পেট্রোল চালিত একটি গাড়িকে CNG-তে বদলাতে হলে ২৫ হাজার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি চালক ও ইউনিয়ন সমূহ পেট্রোবাংলা গৃহীত CNG রূপান্তরে সহযোগিতা করে না। কারণ CNG ব্যবহার করলে পেট্রল চুরির কোন অবকাশ থাকে না। সরকারের CNG রূপান্তরের পরিকল্পনার বাস্তবায়নও খুব শ-থ। সারা দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ CNG স্টেশন তৈরীও CNG নীতির একটি অংশ। তবে CNG রূপান্তরে সরকারকে শক্ত অবস্থান নিতে হবে।

২. ডিজেলে সালফার কমানো ঃ বাংলাদেশে ডিজেলে সালফারের পরিমাণ অত্যধিক। যদিও Bangladesh Petroleum Corporation যে ডিজেল আমদানি করে তাতে সালফারের পরিমাণ ০.৫% কিন্তু বিতরণ প্রক্রিয়ায় সালফারের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ১%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও জাপানে ব্যবহৃত ডিজেলে সালফারের মান হচ্ছে ০.০৫%। ডিজেল থেকে সালফার দূরীকরণের প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে – hydro-desulfurization (HDS). HDS প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়াম জাতীয় রাসায়নিক পদার্থে কার্বন ও সালফারের বন্ধনকে ভেঙ্গে দিয়ে সালফারকে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত করে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি করা হয়। এই গ্যাসকে সহজেই সরানো যায়। পুরানো নিম্নচাপের HDS কারখানা ৬০ থেকে ৭৫% সালফার সরাতে পারে। নতুন উচ্চচাপের HDS প্রক্রিয়ায় সালফারের পরিমাণ ০.০৫% করতে লিটার প্রতি ১ মার্কিন সেন্ট লাগবে। তবে পুরনো HDS কারখানাগুলোতে রূপান্তরে করতে প্রতিলিটার ডিজেলে খরচ পড়বে ১.৬ থেকে ১.৯ মার্কিন সেন্ট। তবে বর্তমানে ঢাকার বায়ুতে ডিজেল-সালফারের পরিমাণ কমাতে নতুন কারখানার অবশ্যই প্রয়োজন।

৩. সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঃ জনপরিবহণকে সহজ করতে হালকা রেল ও নদী-ট্যাক্সির প্রচলন করা যেতে পারে। পুরানো বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা, যেমন ফ্লাইওভার কিংবা রাস্তা পারাপারের জন্য সুরঙ্গ, যানজট ছাড়াতে সাহায্য করেনি। বরং জনসংখ্যা স্ফীতি ও সেই অনুযায়ী পরিবহণ চাহিদা অবস্থার আরো অবনতি করেছে। সেই জন্যে একটা নতুন সার্ভের দরকার যা কিনা ভবিষ্যতে রাস্তায় ট্রাফিক প্রবাহের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে। তাছাড়া একটা মডেল বাস সার্ভিসের প্রচলন করা যেতে পারে। যা কিনা ভাল ব্যবস্থাপনায় কিভাবে বাস চালান সম্ভব সেটা প্রদর্শন করবে। একই সঙ্গে সব বাস রুটগুলির মূল্যায়ন ও চালকদের ট্রেনিং প্রয়োজন।

৪. Dispension Model Analysis ঃ পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পটি ঢাকা শহরের বায়ু দূষণকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য সৃষ্ট। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে গৃহীত তাৎক্ষণিক বায়ু পর্যবেক্ষণ থেকে বায়ু দূষণের একটা সঠিক মানচিত্র তৈরী করা এর উদ্দেশ্য। সেই মানচিত্র অনুযায়ী দূষণের মাত্রা ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা যাবে। কিন্তু একটা স্টেশনের পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই ভবিষ্যৎবাণী করা যাবে না। অন্যদিকে ঢাকার মত

বড় শহরের অনেক জায়গায় পর্যবেক্ষণ স্টেশন বসানো বেশ খরচের ব্যাপার। এর সমাধানে dispension নামে একটি বিশে-ষক মডেলের সাহায্যে আমরা বায়ুদূষণের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাসেট তৈরী করতে পারি। এই মডেলটি প্রাথমিক উৎস ও দূষণের ডাটা অনুযায়ী যেখানে পর্যবেক্ষণ হয়নি, সেখানকার দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করতে পারবে। শহরের পরিকল্পনাবিদরা এই ডাটা ব্যবহার করে ভবিষ্যত (ভূমি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট) দূষণের মানচিত্র তৈরী করতে পারবেন।

৫. ভূমি ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা ঃ ভবিষ্যতে ভূমির সঠিক ব্যবহার দরকার। শহরের ক্রমবর্ধমানতা ও তার সঙ্গে অপরিকল্পিত নির্মাণ নাগরিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। ঢাকা ও অন্যান্য শহরের কর্মক্ষেত্রগুলি আবার খুবই কেন্দ্রীভূত, এর ফলে শহরের মধ্যে ট্রাফিকের প্রবাহ বেড়েছে। তাই শহরের সাশ্রয়ী উন্নতির জন্যে যেমন দরকার ভূমি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ, তেমনি দরকার কর্মক্ষেত্রগুলিকে অকেন্দ্রীভূত করা।

পরিশেষে শহরের সার্বিক দূষণ সমাধানে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে ঃ

১. বিভিন্ন উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বাড়ান যাতে একই প্রচেষ্টা অনেকবার গৃহীত না হয়,

২. জ্বালানী থেকে সালফার কমান,

৩. পূর্ণ জ্বালানী হিসেবে সিএনজি'র প্রচলন ও স্টেশনের সংখ্যা বাড়ান,

৪. বেসরকারি উদ্যোগে জন-পরিবহন অবকাঠামোর উন্নতি করা,

৫. ট্রাফিক প্রবাহের সরবরাহ ও চাহিদার সার্ভে করা,

৬. একটি মডেল বাস সার্ভিসের পাইলট প্রকল্প সৃষ্টি করা, এবং

৭. পরিবেশ-সাশ্রয়ী একটি জন-পরিবহন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা। ❑

লেখক পরিচিতি ঃ **ড. মাসুদ করিম** একজন আন্তর্জাতিক পরিবেশ কর্মী, Bangladesh Environmental Network-এর সদস্য, বর্তমানে কানাডার অন্টারিও প্রদেশের ব্র্যাম্পটনে International Air Quality তে কর্মরত।

অনুলিখন ঃ **দীপেন ভট্টাচার্য**।

পরিবেশ

হাসান হাফিজ

পরিবেশ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এখন আগের চেয়ে বেশী সচেতন। পরিবেশ এখন বিমূর্ত কোনও বিষয় নয়। শিক্ষিত, নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলেই এখন পরিবেশ বিষয়ে কমবেশি সচেতন। দশ কিংবা পনেরো বছর আগের চিত্র কিন্তু এরকমটি ছিল না। মেগাসিটি বলে কথিত ঢাকার পরিবেশ সমস্যাও মেগাই। এই পাহাড়প্রমাণ পরিবেশ বিপর্যয় যে কীভাবে রোধ করা যাবে, তা কারও পক্ষেই বলা মুশকিল।

বিষাক্ত ধোঁয়া, ধুলো, বর্জ্য সমস্যা নিয়ে নগরবাসী আজকাল যতটা উৎকণ্ঠিত, আগে ততটা ছিলেন না। টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের বেবীট্যাক্সি যে ঢাকার ভয়ঙ্কর বায়ুদূষণের মুল কারণ, সেটা নাগরিকরা ভালোই বুঝতে পেরেছেন। ধোঁয়াক্রান্ত ঢাকা মহানগরীতে মুখোশ পরে চলাচল করতে হয়, পরিস্থিতি এমনই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জনবাহুল্য, পৌর কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য, অক্ষমতা যে কত ব্যাপক, তা মহানগরীর যে কোনও রাস্তাঘাট দেখলেই সহজে বোঝা যায়। অবশ্য এটাও ঠিক, সব কিছু সরকারের কাঁধে চাপালে সমস্যার সমাধান হবে না। নাগরিকদের মধ্যে সিভিক সেন্সেরও প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। সেজন্যে জনসচেতনতা তৈরির আরও বহু কাজ এখনও বাকী রয়ে গেছে।

টু স্ট্রোক ইঞ্জিনচালিত বেবীট্যাক্সি চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সরকারকে তাই তেমন কোনও বড় ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। আগেও এ চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বেবীট্যাক্সি চালকদের তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য হতে হয়েছিল তখন। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ফলে এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত হয়তো সফল হবে বলে আশা করা যায়।

পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত সফল হয়েছে। পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ও তা বাস্তবায়ন করার এই কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। আগেও একই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সেবার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে এ যাত্রা আপাতসাফল্য অর্জিত হলেও পরিবেশের নীরব ঘাতক পলিথিনব্যাগ আবার হাজির করা হচ্ছে চোরাগোপ্তাভাবে। এ ব্যাপারে সরকারি দফতর, বিশেষ করে পরিবেশ অধিদফতরের যতটা সক্রিয় থাকবার কথা, ততটা সক্রিয় তারা আছেন বলে মনে হয় না। থাকলে এ ঘটনা ঘটতে পারতো না।

পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যে সচেতন, তার প্রমাণ মিলবে কয়েকটি ঘটনায়। নিকট অতীতে ঢাকার ওসমানী উদ্যান রক্ষার আন্দোলনে অর্জিত সাফল্য সে কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। শীর্ণ, মুমূর্ষু বুড়িগঙ্গাকে বাঁচানোর আন্দোলনও ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। বুড়িগঙ্গা বাঁচলে ঢাকা বাঁচবে–এই চেতনা ও বোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। জনদাবি মেটাতে সরকার বুড়িগঙ্গার বুক থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। গঠিত হয়েছে শক্তিশালী টাস্ক ফোর্স। এই টাস্ক ফোর্সে সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সুশীল সমাজেরও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এটা পরিবেশবাদীদের আরও একটা বিজয় – একথা বলতেই হবে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও মৃতপ্রায় বুড়িগঙ্গার দু'পাড় থেকে অবৈধ স্থাপনাসমূহ নির্মমভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এবার টাস্ক ফোর্স ঠিক করেছে, উচ্ছেদই শুধু নয়, অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। টাস্ক ফোর্স সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করবে শিগগিরই। এই সুপারিশমালায় যেসব ইস্যু অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তার মধ্যে রয়েছে ঃ নদীর তীরভূমির মালিকানা নির্ধারণ, অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ, নদীর তীরভূমি রক্ষা, নদী দূষণমুক্ত করা/রাখা, নদীর দীর্ঘমেয়াদী নাব্য অর্জন/সংরক্ষণ ইত্যাদি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমের পর ভূমিদস্যুরা আবার তৎপর হয়ে উঠে এবং নতুন করে তাদের লোলুপ হাত প্রসারিত হচ্ছে। নদী তার নিজস্ব প্রবাহ ফিরে পাবে, এবার স্থায়ী এমন একটা ব্যবস্থা মানুষ দেখতে চাচ্ছেন।

পরিবেশ আদালত গঠন করেছেন সরকার। কিন্তু সে আদালতে তেমন কোনও মামলা নেই। মামলা-মোকদ্দমা সাধারণত মানুষ এড়িয়েই চলতে চায়। পরিবেশের যারা শত্রু, তাদের হাত শক্তিশালী, চক্রান্তেও তারা বড়। অর্থের কাছে, প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে জনস্বার্থ মার খায় – চিরন্তন এই দৃশ্য দেখে দেখে মানুষ হতাশ, ক্লান্ত। এ অবস্থা কোনও সুস্থ মানুষেরই কাম্য নয়। পরিবেশকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে। শুধু সরকার নয়, সব মানুষকেই এ সংগ্রামে শরীক হতে হবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ম্যানিফেস্টোতে পরিবেশের বিষয়টি এখনও উপেক্ষিত। তাদের কর্মসূচি ও লক্ষ্যে যতটা গুরুত্ব পাওয়ার কথা পরিবেশের, ততটা গুরুত্ব এখনও দেয়া হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো যে দেউলিয়া, তাদের চিন্তা-চেতনায় দৈন্য রয়েছে, এটা তার প্রমাণ। অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যাপারেও ইতিবাচক পরিবর্তন হবে – মানুষের প্রত্যাশা তাই। ❑

লেখক পরিচিতি ঃ কবি ও প্রবন্ধকার, ঢাকা।

‘নগরীর এইসব সমস্যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি’

সাদেক হোসেন খোকা, ঢাকা মেয়র

পড়শী : আপনার ওপর তো ঢাকাবাসীর অনেক প্রত্যাশা। কতটুকু পূরণ করতে পারছেন?

সাদেক হোসেন খোকা : প্রত্যাশার পুরোটা পূরণ করা কঠিন। চেষ্টা করছি। আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না।

পড়শী : আপনার দৃষ্টিতে ঢাকা নগরের প্রধান সমস্যা কী?

খোকা : ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি লোক বাস করে ঢাকা শহরে এটাই তো বড় সমস্যা?

পড়শী : ঢাকার প্রধান তিনটি সমস্যা কী?

খোকা : এভাবে তো বলা সম্ভব নয়। যত মানুষ ঢাকা শহরে বাস করে তত মানুষের জন্যে পানি সাপ-ই দেয়ার ক্ষমতা ঢাকা ওয়াসার নেই। যদিও সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-্যান্ট তৈরি এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়েছে। আমাদের সরকারের এ বিষয়ে আরো কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যার জন্যেও নগরবাসীর দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আমি মেয়র হিসেব যখন দায়িত্ব পেয়েছি তখন ঢাকা শহর বিধ্বস্ত। প্রায় প্রতিটি রাস্তা ভাঙ্গাচোরা। বৃষ্টির মৌসুমের কারণে ভাঙ্গা রাস্তা মেরামতের কাজেও হাত দিতে পারিনি। ঢাকা নগরীর এই সব সমস্যা আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকাবাসীর জন্যে কিছুই করেনি। এখন বৃষ্টির মৌসুম শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা রাস্তা মেরামতের কাজে নেমে পড়েছি। মশা ঢাকাবাসীর আরেক যন্ত্রণার কারণ। মশা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অতীতে অনেক দুর্নীতি হয়েছে। তার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি, নিচ্ছি। মশার হাত থেকে নগরবাসীকে কিভাবে বাঁচানো যায় সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা চলছে।

পড়শী : পরিবেশ দূষণ তো ঢাকা নগরের আরেক সমস্যা?

খোকা : পরিবেশ দূষণ রোধের জন্যে আমাদের সরকার ইতিমধ্যে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনের বেবিট্যাক্সি নিষিদ্ধ করেছি। ২০ বছরের পুরনো গাড়ি নিষিদ্ধ করেছি।

পড়শী : পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা কী?

খোকা : ঢাকাবাসীর যে কোনো সমস্যা দেখার দায়িত্ব তো সিটি কর্পোরেশনের। কিন্তু কয়েকটি সংস্থা এখানে কাজ করে। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। আমরা চেষ্টা করছি এই সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে অতীতে সিটি কর্পোরেশন তেমন কোনো কাজ করেনি। ভবিষ্যতে আমরা এ বিষয়ে সক্রিয় হওয়ার উদ্যোগ নেব।

পড়শী : ঢাকার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?

খোকা : এর জন্যে তো পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রয়েছে। তবে আমরা এ বিষয়ে কাজ করার উদ্যোগ নেব।

পড়শী : এই মুহূর্তে ঢাকা নগরের পরিবেশ দূষণ কতটা মারাত্মক?

খোকা : কিছুদিন আগে পর্যন্তও পরিবেশ দূষণ ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ ছিলো। আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

পড়শী : নদী এবং লেইক ভরাট বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

খোকা : আমাদের সরকারের এ বিষয়ে আবস্থান খুব পরিস্কার। নদী এবং লেইক কাউকে ভরাট করতে দেয়া হবে না। যারা ভরাট করেছে তাদেরকেও উচ্ছেদ করা হবে। কোনো আপোষ করা হবে না।

পড়শী : প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

খোকা : প্রবাসীদের প্রতি আমাদের সরকার খুবই আন্তরিক। এজন্যে আমরা প্রবাসী মন্ত্রণালয় গঠন করেছি। সকল প্রবাসী এবং পড়শীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ❑

আলাপচারিতা ঃ পড়শী ঢাকা প্রতিনিধি।